দৈনিক বাংলা
তারিখ ... 22 DEC 1994
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

# উচ্চ মাধ্যমিক ॥ পাস-ফেলের খতিয়ান

চার বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষার ফল একসঙ্গে প্রকাশিত হয়েছে। পরীক্ষার ফল নিয়েই এখন ঘরে ঘরে হাসি–কান্না। সার্বিক ফলাফল যাই হোক না কেন, পরীক্ষার ফল বেরোলেই উচ্চ সাফল্যের নিরিখে কতিপয় মেধার পরিচয় পাওয়া যায়। বিশেষ সম্মানে চিহ্নিত পরীক্ষার্থী আর তাদের স্বজনেরা তো উল্লসিত হনই, আমরাও সকলেই প্রশংসার দৃষ্টি নিয়ে তাদের দিকে তাকাই। আমরা তাদের অভিনন্দন জানাই। এটাই স্বাভাবিক। ওদের কৃতিত্বে প্রতিফলিত হয় আমাদের ভবিষ্যতের সম্ভাবনা।

এইচএসসিতে এবার যারা উচ্চ সাফল্য অর্জন করেছে তাদের ঘরে তো আনন্দের বান ডাকবেই। সম্ভবত যারা কোনভাবে উৎরে যেতে পেরেছে তাদের ঘরেও হাসি–খুশির আবহই বিরাজ করছে। কেননা, এবার পাসের হার প্রত্যাশার চেয়ে অনেক অনেক কম। চার বোর্ডের মিলিত ফলে ষাট শতাংশেরও কিছু বেশী শিক্ষার্থীকে অকৃতকার্যকারিতার অভিশাপ মাথায় নিয়ে এখন লজ্জায় মুখ লুকোতে হচ্ছে। হাসির চেয়ে এবার তাই কান্নার পরিমাণই অধিক।

এইচএসসি তথা মাধ্যমিকের সীমা পেরিয়ে আজ যারা উচ্চ শিক্ষার পথে পা বাড়ানোর অধিকার পেয়েছে, তাদের সকলের প্রতি আমাদের অভিনন্দন। আমাদের প্রত্যাশা, তাদের উজ্জ্বল উপস্থিতি আমাদের উচ্চশিক্ষার অঙ্গনকে প্রোজ্জ্বল করে তুলবে। ওদের সাধনা সফল করবে এ জাতির দীর্ঘ লালিত স্বপ্নসাধ।

অভিনন্দন জ্ঞাপনের এ পর্যায়ে এবার আমাদের মেয়েদের কথা বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। কেবল মেধাতালিকায়ই তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়নি, ওদের সাফল্যের হারও ছেলেদের তুলনায় উচ্চ। তুলনামূলকভাবে পিছিয়ে থাকা এ দেশের মেয়েদের এ অগ্রযাত্রা জাতীয় জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে সন্দেহ নাই।

মাধ্যমিক পর্যায়ের শিক্ষার সমাপ্তি কেবল শিক্ষার্থীর জন্যেই নয়, গোটা জাতির জন্যেই একটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা, এ পর্যায়ের সাফল্য–ব্যর্থতার উপরই নির্ভর করে উচ্চ শিক্ষার মান ও প্রকৃতি। যা পরে গোটা জাতির জীবনধারা নিয়ন্ত্রণে অবদান রাখবে। এইচএসসির ফল প্রকাশের পর তাই হাসি–কান্নায় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে কিংবা অভিনন্দন আর সমবেদনা জানিয়ে নিজেদের দায়িত্ব মুক্ত ভাবার উপায় নেই। বিষয়টি একটু খুঁটিয়ে, একটু তলিয়ে দেখার দরকার আছে।

এই তলিয়ে দেখার শুরুতেই কিন্তু আমাদের সব আনন্দ হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। পাসের হার এবার দাঁড়িয়েছে চল্লিশ শতাংশেরও একটু নিচে। অর্থাৎ প্রতি একশ জনে ষাটজনেরও বেশী নেহাত পাস করতেও ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতার দায় কার উপর বর্তাবে? সবকিছু হিসাবে নিলে এ ব্যর্থতার দায় শিক্ষার্থীদের উপর চাপিয়ে নিষ্কৃতি পাওয়ার উপায় নেই। এর সিংহভাগ অন্তত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার উপরই বর্তাবে। আর এ নিয়েই যত যন্ত্রণা।

এইচএসসির এবারকার পরীক্ষার্থীরা বিরানব্বই সালে এসএসসি পরীক্ষার্থী ছিল। নতুনভাবে প্রবর্তিত নৈর্ব্যক্তিক প্রশ্ন পদ্ধতি সেবারই প্রথম ব্যবহার হয়। এসএসসিতে তাদের সাফল্যের হার ছিল ষাট শতাংশেরও কিছু বেশী। বিরানব্বই–এ বাছাই হয়ে যাওয়া, আর বাছাই করে শতকরা চল্লিশ জনের মত শিক্ষার্থীকে পেছনে ঠেলে দেয়ার পর এদের সাফল্যের হার ষাটের বেশী হওয়াই সঙ্গত ছিল। বেশী হওয়া তো দূরের কথা, এখন দেখা যাচ্ছে এই বাছাই করা ষাট শতাংশেরই বড় একটা অংশ অযোগ্য প্রমাণিত।

নয়া পদ্ধতির আগের বছরের ফলাফলের সঙ্গে তুলনা করলেই আমাদের আপত্তি বা ক্ষোভের কারণ স্পষ্ট হবে। একানব্বইর এসএসসিতে পাসের হার ছিল ষাট–এর কাছাকাছি। এইচএসসিতে ওদের পাসের হার সাতষট্টিতে উন্নীত হয়। প্রথম বিভাগে পাসের হারও এসএসসির চেয়ে বেশী ছিল। এবার বাড়াতো দূরের কথা, এক তৃতীয়াংশের মত কমে গেছে। প্রথম বিভাগে বা কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণের হার আরও কম।

এক বছরের আগে পরের একদল শিক্ষার্থীর মেধায় অমন পার্থক্য থাকার কথা না। আর শিক্ষার পরিবেশের কথাই যদি ওঠে, স্বীকার করতে হবে, সার্বিক পরিস্থিতি পরিপূর্ণ সন্তোষের যোগ্য না হলেও ক্রমউন্নতিশীল। অর্থাৎ আগের চেয়ে ভালো। পরিবেশের উপর দায় চাপানোরও তাই উপায় নেই।

এরপর বাকি থাকে একটাই। আর তা হচ্ছে সার্বিক শিক্ষা ব্যবস্থা। আর বিশেষ করে দেখতে গেলে পরীক্ষা পদ্ধতি। পাঁচশ প্রশ্নের ব্যাংক নির্ভর নৈর্ব্যক্তিক পরীক্ষা প্রবর্তনের পরই এর বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনার সূত্রপাত ঘটে। আশংকা প্রকাশ করা হয়, এর ফলে শিক্ষার মান মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। সদ্য প্রকাশিত এইচএসসির ফল এ আশংকাকেই সত্য বলে প্রমাণ করেছে।

টিক দিয়ে যারা মাধ্যমিকে উচ্চ সাফল্যের সার্টিফিকেট পেয়েছে, উচ্চ মাধ্যমিকে এসে এই ব্যাংক–নিরাপত্তা না থাকায় তাদের কেউ কেউ আটকে পড়েছে। এইচএসসির ফল এবং বিপুলতর সংখ্যক শিক্ষার্থীর ব্যর্থতাকে এভাবেই এখন ব্যাখ্যা করা হচ্ছে। পাল্টা যুক্তি টেনে এ ব্যাখ্যা উড়িয়ে দেয়ার উপায় নেই।

পাল্টা যুক্তি টেনে বলা যায়, টিক মারাদের কেউ কেউ তো এ পরীক্ষায়ও ন'শ' ছত্রিশ বা তার কাছাকাছি নম্বর পেয়েছে। অতএব নির্ধারিত পাঁচশ প্রশ্নের উপর নির্ভর করে কৃতিত্ব দেখানোকেও খাটো করে দেখার কিছু নেই। কোন কৃতিত্বকেই খাটো করে দেখার বা দেখানোর উদ্দেশ্য আমাদের নেই। তবু বলতে হয়, এই উচ্চ সাফল্যের প্রতিটিই ব্যতিক্রম। ব্যর্থতার এই পাহাড়ের মোকাবিলায় ব্যতিক্রমী সাফল্য নিয়ে উচ্ছ্বসিত হওয়া সম্ভব হলেও এর উপর নির্ভর করে শিক্ষার ভবিষ্যৎ নিয়ে নিঃশ্চিন্ত হওয়া যায় না। আর ব্যতিক্রম দিয়ে কোন সাধারণ সত্য বা সিদ্ধান্তে পৌঁছা যে সম্ভব নয়, সে তো সবারই জানা।

কথা তাই একটাই, এইচএসসির ফল আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা এবং বিশেষভাবে পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বলতাকেই আবার স্পষ্ট করেছে। কতিপয় চিহ্নিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তুলনামূলক সাফল্যের ঔজ্জ্বল্য সাধারণভাবে পঠন-পাঠনের মানের দুর্বলতারই সাক্ষ্য বহন করছে। বিষয়টিকে তাই গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করে এর প্রতিকার নির্ণয় এবং তার বাস্তবায়নের উদ্যোগ নিতে হবে।

বলা যেতে পারে, প্রশ্ন ব্যাংকের নিরাপত্তা বা দুর্দৈব অচিরেই শেষ হতে যাচ্ছে। এ বিপত্তি ওঠে গেলে এসএসসির মান ফিরে আসবে। আসুক আমরা তাই চাই। আসবে বলেও ভরসা রাখি। তবু এটুকু আশ্বাসেই নিশ্চিতও বোধ করতে পারি না। আগামী এবং তার পরের এইচএসসির মান আর ফলাফল নিয়ে দুর্ভাবনা থেকেই যায়।

পরপর তিন বছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের মান যদি এমন দুর্বল হয়, ব্যর্থতার বোঝা যদি এমন বিশাল হয়ে দাঁড়ায়, তার চাপে ভবিষ্যতের শিক্ষার আয়োজনই মুখ থুবড়ে পড়ার ভয় আছে। এমনিতেই আমাদের উচ্চ শিক্ষার মান নিয়ে সমালোচনার শেষ নেই। মাধ্যমিকের অবস্থা যদি এমনই দাঁড়ায়, উচ্চ শিক্ষার হাল করুণতর হতে বাধ্য।

এর প্রতিকার কি হতে পারে তা অবশ্যই শিক্ষা বিশেষজ্ঞেরা নির্ধারণ করবেন। আমাদের বক্তব্য একটাই, যা করার তাড়াতাড়ি করুন এবং লক্ষ্য রাখবেন, তা যেন শিক্ষার্থীদের জীবন নিয়ে পরীক্ষা–নিরীক্ষায় না দাঁড়ায়। জাতির ভবিষ্যৎ পরীক্ষাগারের ইঁদুর–বাঁদর হতে পারে না, এ কথাটি সব অবস্থায়ই মনে রাখতে হবে।

অন্তর্বর্তী ব্যবস্থা হিসাবে করণীয় একটাই আছে, মাধ্যমিক পর্যায়ে পঠন–পাঠনের মান বাড়ানোর উপর জোর দেয়া। শ্রেণী কক্ষে যদি পঠন–পাঠানোর উপর জোর দেয়া হয়, পরীক্ষা পদ্ধতির দুর্বলতা সত্ত্বেও যোগ্য শিক্ষার্থী বেরিয়ে আসা সম্ভব। মাধ্যমিক পর্যায়ে দুর্বলতা স্থায়ী হলে উচ্চ শিক্ষার ভিত নড়বড়ে থাকবেই। ব্যর্থতার দায় শিক্ষার্থীদের উপর না চাপিয়ে ব্যবস্থাপনার সংশোধনেই তাই মন দিতে হবে।

— সালেহ চৌধুরী